এবং মুশায়েরা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
২৮তম বর্ষ □ ১ম-২য়-৩য় সংখ্যা
বৈশাখ - আষাঢ় ১৪২৮ □ এপ্রিল - জুন ২০২১
শ্রাবণ - আশ্বিন ১৪২৮ □ জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২১
কার্তিক - পৌষ ১৪২৮ □ অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২১

৮৪

শারদীয় ১৪২৮

সম্পাদক : সুবল সামন্ত

৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০
দূরভাষ : ২৫১০০৭৮৭ / ৯৪৩২২৫৪৩১৩ / ৯৮৭৪৯৪৩২৫৫
E-mail: mushayera@gmail.com
Website: www.ebangmushayera.com

স্মরণ

চিত্রশিল্পী হৈমন্তী সেন		১৫৭
আমার মা	ইন্দ্রনাথ মজুমদার	১৫৯
মধুর স্মৃতি	হৈমন্তী সেন	১৬০
আমার কথা	হৈমন্তী সেন (মজুমদার)	১৬২
হৈমন্তী সেন-এর আঁকা কয়েকটি চিত্র		১৬৬
রমানাথ রায়		
রমানাথ রায় : আমার বন্ধু ও লেখক	শেখর বসু	১৭৪
রমানাথ যেরকম	আশিস ঘোষ	১৭৭
প্রবন্ধ		
আনা আখমাতোভার কবিতা	রবিন পাল	১৮০
হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ও বাংলা কবিতা	উদয় শংকর বর্মা	১৮৯
বলেন্দ্রনাথের ওড়িশা ভ্রমণ	মুনমুন ঘোষ	২০১
ছোটোগল্পের বিমল মিত্র	গোপা দত্ত ভৌমিক	২১১
ছোটোগল্পে কথাশিল্পী আলপনা ঘোষ	মীরাতুন নাহার	২২৯
ছোটোগল্পকার জয়ন্ত দে	স্বস্তি মণ্ডল	২৩৯
তন্বী হালদারের গল্প: ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে উত্তরণ	শ্রাবণী পাল	২৫৬
শুভমানস ঘোষের গল্প	নবনীতা বসু	২৭২
সমীরণ দাসের গল্প	দেবাশিস ভট্টাচার্য	২৮৮
মুর্শিদ এ এম— এর গল্প	রাবেয়া বাসরি	২৯৩
আত্ম-অতিক্রমণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ... হাইডেগার...	সঙ্গীতা গৌতম	৩০৪
মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক : প্রতিবাদী চেতনা	আশিস রায়	৩১৪
আফগানিস্তান ও নারী	উৎকলিকা সাহু	৩২৩
সত্যজিতের গল্পমালায় বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রের অনুরণন	নম্রমিতা ভূইয়া	৩২৯
উনিশ শতকের নটীদের সমাজ-সংগঠন, সভা, সমিতি	মৌ চক্রবর্তী	৩৪০
মহীনের ঘোড়াগুলি: ঝরা সময়ের গীতিকাব্য...	সৌভিক চ্যাটার্জী	৩৪৭
অণুগল্পের বনফুল	সজল কান্তি দোলই	৩৫৬
পুষ্কর দাশগুপ্ত : প্রথাবদলের কবি	অর্ণব সেন	৩৬৫
পরেশ মণ্ডলের কবিতা : অক্ষরের কাফেলা	গালিবউদ্দিন মণ্ডল	৩৭৩
অতীন্দ্রিয় পাঠকের কাব্যভুবন:	বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য	২৮০
মহানগর: আধুনিকতা, নগরায়ণ এবং নারীবাদ	রিতা দত্ত	৩৮৭
কামোঁয়েশের সনেট	পলাশ বরন পাল	৩৯২

মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক : প্রতিবাদী চেতনা

আশিস রায়

সকলেই জানতেন 'তিনি' পারবেন। তিনি ছিলেন সকলের কাছে একটি ভরসার জায়গা। বামপন্থী বিপ্লবী রাজনীতিবিদ রণেশ দাশগুপ্ততো জানতেনই একমাত্র তিনিই পারবেন। উঁচু পাঁচিল দেওয়া জেলের চার দেওয়ালের অন্ধ কুঠুরির মধ্য থেকে অন্য কুঠুরিতে চিঠি লিখে তিনি জানালেন কাছেই একুশে ফেব্রুয়ারি একটি নাটক লিখে দিতে হবে। চিঠিতে এও জানিয়ে দিলেন নাটকটি জেলখানাতে অভিনীত হবে। রণেশদার কথা অমান্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই। চিঠিটি পেয়ে তিনি বরং আপ্লুতই হলেন। তাই '১৯৫৩ সালের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সেই উত্তপ্ত দিনগুলোতে ডিসেম্বর আর জানুয়ারির শীতার্ত রাতগুলোতে যখন জেলের একটি কামরায় বসে দারুণ এক অস্থিরতার শিকার হয়ে সমস্ত মন ঢেলে একটি ছোট খাতায় লিখছিলেন কবর নাটকটি।'[১] আর 'তিনি' হলেন বিপ্লবী, গবেষক, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী।

বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক নাটক সম্ভবত 'কবর'। কেন এমন রাজনৈতিক নাটক রচনা করতে হল মুনীর চৌধুরীকে ? কেন তিনি জেলখানাতে বসে নাটকটি রচনা করলেন ? কেন দিনগুলো এত উত্তপ্ত হয়ে উঠলো? চলুন একটু উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক। আমরা প্রত্যেকেই জানি ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত অধিরাজ্য ও পাকিস্থান অধিরাজ্য নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্থান আবার দুটি অংশে বিভক্ত হল পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্থান) ও পশ্চিম পাকিস্থান। দুই পাকিস্থানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক কারণে এদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য ছিল। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্থান সরকার ঘোষণা করে উর্দু হবে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণার পর থেকে পাকিস্থান পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে তাদের অনুমোদিত তালিকা থেকে বাদ দেয় এবং সরকার মুদ্রা ও ডাকটিকিট থেকে বাংলাকে অবলুপ্ত করার চেষ্টা শুরু করে দেয়। পূর্ব বাংলার মানুষরা এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। রাষ্ট্র ভাষা উর্দুর বিরুদ্ধে তারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল, সভা, সমিতি করতে থাকেন। ভাষাবিদ মহম্মদ শহীদুল্লাহ জানান পাকিস্থানের কোন জায়গাতেই উর্দু স্থানীয় ভাষা ছিল না। তিনি জানান — 'আমাদের যদি একটি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়, তবে আমরা উর্দুর কথা চিন্তা করতে পারি।'[২] একই ভাবে সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমেদ জানিয়ে দেন — 'উর্দুকে যদি রাষ্ট্র ভাষা করা হয় তবে পূর্ব পাকিস্থানের শিক্ষিত সমাজ

নিরক্ষর' এবং সকল সরকারি পদের ক্ষেত্রেই 'অনুপযুক্ত' হয়ে পড়বে।" সমাজের কোন স্তরের মানুষই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারলো না। তারা তুমুল আন্দোলনে শামিল হল। আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। সমস্ত আন্দোলনকে সরকার বে-আইনি ঘোষণা করে দেয়। সবরকম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে। তিমিরতলা চুলা আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দিলেন তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় আসেন এবং ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিয়ে জানিয়ে দেন পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯ জানুয়ারি প্রতিবাদ সভা করে এবং ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। প্রত্যেকেই ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায়। ৩১ জানুয়ারি ৪০ জন সদস্যকে নিয়ে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ গঠন করা হয়। তারা জানিয়ে দেয় ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হয়। তারাও বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বার করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সরকার জানিয়ে দেয় ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় এক মাসের জন্য কোন প্রকার সভা সমিতি করতে পারবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার সংলগ্ন এলাকাতে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। ছাত্ররাও বিভিন্ন হলে সভা করে জানিয়ে দেয় তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন। ২১ ফেব্রুয়ারি, সকাল ৯ টা থেকে ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে জমায়েত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন। ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে তারা স্লোগান দিতে থাকে এবং সরকারকে পুনর্বিবেচনা করতে বলে ভাষা সম্পর্কে জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। পুলিশ অস্ত্র হাতে ছাত্রদেরকে ঘিরে ফেলে। বেলা সোয়া এগারোর সময় ছাত্ররা রাস্তায় নামতে চাইলে পুলিশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এবার শুরু হল ছাত্রদের পুলিশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পুলিশ ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য ক্যাম্পাসের কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও নিয়ে ছেড়ে দেয়। এই ঘটনায় ছাত্ররা আরো বেশি করে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সরকারের দিক থেকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বেলা ২ টোর সময় আইন পরিষদের সদস্যরা আইন সভায় যোগ দান করার জন্য এলে ছাত্ররা তাদের বাঁধা দেয়। এবং তারা জানিয়ে দেয় আইন সভায় গিয়ে তারা তাদের প্রস্তাব তুলে ধরবে। বেলা ৩ টে নাগাদ ছাত্ররা আইন সভার দিকে যাত্রা শুরু করলে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আব্দুল জব্বার, রফিক উদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সালাম, আবুল বরকত সহ অনেকেই মারা যান। ছাত্রদের মৃত্যুর সংবাদে সমস্ত শহর স্তব্ধ হয়ে যায়। অফিস, দোকানপাট, পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের শুরু করা আন্দোলনের সাথে সাধারণ মানুষ যোগ দেয়। সমস্ত ঘটনাই করুন নাটক হট্টি দৃশ্যের উচ্চুইত সামনেই ঘটে গিয়েছে। একটা

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন — 'আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেমাত্র শিক্ষাকতায় ঢুকেছি — সাইকেলে চড়ে ক্লাস করতে যেতাম। এগারটার সময় ক্লাস করে বাসায় ফিরছি। সাইকেলে থাকা অবস্থাতেই টিয়ার গ্যাস এর শব্দ আমার কানে আসছিল — আমি বাসায় না গিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু পথে গিয়েই দেখলাম, সারা পথ ফাঁকা, থমথমে, ইপিআর — এর গাড়িগুলি যাচ্ছে-আসছে — বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে ছেলেরা। একেবারে গুলি চালানোর পূর্ব অবস্থা। একজন পুলিশ সার্জেন্ট আমাকে সাইকেল সমেত থামালো — 'ভাগো হিয়াসে'। ... পেছন থেকে লাঠি দিয়ে আঘাত করল একজন পুলিশ — আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। আজকে সেই দিনের কথা মনে করেই আমার ড. জোহার কথা মনে পড়ছে। জোহা সেটা সহ্য করতে পারেননি — আর পারে নি বলেই জীবন দিয়ে তাঁকে চলে যেতে হলো। সাইকেলে উঠিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পুলিশ আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল — আমি ভিসির কাছে নালিশ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যাবার পথেই শুনলাম গুলির শব্দ। তার পর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো ছাত্র-হত্যার সংবাদ, যার কাছে আমার নিজের সংবাদ মনে হচ্ছিল অর্থহীন।[*] আর একটি সাক্ষাৎকারে মুনীর চৌধুরী জানাচ্ছেন — ৫২ সনের মহান ভাষা আন্দোলনে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু এ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন না। গুলির শব্দ শুনে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন। প্রায় আড়াই বছর তাকে কারাগারে রাখা হল। একসাথে পনেরো বিশজন রাজবন্দীর সঙ্গে তিনি একটি ঘরে থাকতেন। অন্য আর একটি ঘরে থাকতেন ষাট-সত্তর জনের মতো রাজবন্দী তাদের মধ্যে ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। নাটক লেখার আবেদন রণেশদাই করেছিলেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের এক বছরের পূর্তিতে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে জেল খানাতেই রাজবন্দীরা কবর নাটক মঞ্চস্থ করে। জেলখানাতে কবর নাটক মঞ্চস্থ .করার ক্ষেত্রে কি কোন অসুবিধা ছিল না? নাট্যকার জানাচ্ছেন অবশ্যই অসুবিধা ছিল। আর সেজন্য এ নাটকের আঙ্গিকে আনা হয়েছে নতুনত্ব। নাটকটি যেন একটি বিশেষ অবস্থার শিল্পরূপ। একটু ব্যাখ্যা করে কবর নাটকের রচয়িতা জানিয়েছেন — 'যেমন ধরো নাটকটিতে হ্যারিকেনের ব্যবহার রয়েছে যার আলো কবরখানার নির্জনতাকে ফুটিয়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য .করেছে। রণেশদা জানিয়ে দিয়েছিলেন রাত দশটার পর জেলখানার সমস্ত আলো নিভে যাবার পর তাঁদের কক্ষে নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন তাঁরা। যেসব ছাত্রবন্দীরা রাতে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে লেখাপড়া করত, তাদের ৮/১০টি হ্যারিকেন দিয়ে মঞ্চ সাজাতে হবে, সে কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই 'কবর' নাটকটি আলো আঁধারির রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছে।'[*] কিন্তু দুঃখের বিষয় হল নাটকটির প্রথম অভিনয় তিনি দেখতে পারেননি। জেল খানার অন্য কক্ষে ছিলেন তিনি। শুনেছিলেন খুব ভালো অভিনয় হয়েছে। এত উচ্চ প্রশংসিত নাটকটির প্রথম অভিনয় দেখার স্বাদ থেকে তিনি বঞ্চিত থেকে গেলেন চিরতরে।

বাংলাদেশের নাট্য চর্চায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে দিল 'কবর' নাটক। একটি নব এবং মুশায়েরা

যুগের সূচনা করে দিল। কেন এমন কথা বলছি ? তাহলে এতদিন যে নাটক রচনা হচ্ছিল সেগুলোর কোন গুরুত্ব নেই? অবশ্যই গুরুত্ব আছে। তবে সে সব নাটক অনেকটাই এক ঘেয়েমি। পাঠককে তেমনভাবে নাড়া দিতে পারেনি। যেমন পেরেছে কবর। ছোট্ট নাটকটি সমসাময়িক পরিস্থিতিকে যেন চোখের সামনে তুলে ধরছে। রাজনৈতিক আন্দোলননির্ভর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে নাটকটি।

নাটকের বিষয়ের দিকে তাকালে বোঝা যায় ছয়টি চরিত্রের মাধ্যমে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। মঞ্চের আবহ তৈরি হয়েছে হ্যারিকেনের আলোর সাহায্যে। দৃশ্যটি গোরস্থানের এবং সময় শেষ রাত্রি। নাটকের নেতা চরিত্রটি পশ্চিম পাকিস্থানের রাজনীতিবিদ এবং তার হাতে যেন সমাজের শাসনদণ্ডে আর পুলিশ কর্মচারী হাফিজ এই নেতারই তোষামোদ করা কর্মচারি। নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখায় জন্য এরা সমস্ত রকমের কাজ করতে পারে। নাটকের শুরুতেই নেতা গার্ডকে ডাকছেন। নীল কোর্তা পাজামা পরা গার্ড নিভন্ত লণ্ঠন হাতে ছুটে এল। গার্ড তাড়াতাড়ি আসার সময় পুরান কবরের গর্তে পা ঢুকে পড়ে যায়। নেতা আর গার্ড কথপোকথনের সময় ইন্সপেক্টর হাফিজ এসে চুপি চুপি উপস্থিত হয়। হাফিজের নাকে মুখে কাপড় জড়ানো অবস্থা দেখে নেতা ভয় পেয়ে যায়। তবে নেতা চার-পাঁচ বছরের মধ্যে নিজের মনে ভয় ঢুকতে দেয়নি। যারা অসৎ কাজ করে তারা জোর করে ভয়কে আটকাবার বৃথা চেষ্টা করে। ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছে তার হার্ট দুর্বল সাবধানে থাকতে। তাই বেশি সাবধানে থাকে যাতে তার মনের মধ্যে ভয় ঢুকতে না পারে। সে জল খায়। এ জল সাধারণ জল নয়। রঙিন মদিরা। হাফিজও নেতার সঙ্গে কথা বলে ঠিকই কিন্তু নজর থাকে নেতার হাতের রঙিন জলে। হাফিজ জানিয়ে দেয় শহরের চারিদিকে কারফিউ লেগে আছে সেজন্য এখানে কোন গার্ডের দরকার ছিল না। আর লাশ ছিল তো মাত্র কয়েকটা। গোর খুড়ে সে একাই এগুলোর সাফসুফ করে ফেলতে পারত। নেতাও অত্যন্ত চতুর সে এসব কাজ অন্যকারো হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এসব কাজ করতে চায়। গোর দেওয়ার কাজ অনেকটাই হয়ে এসেছিল কিন্তু সামান্য গোলমালের জন্য দেরি হয়ে গেল। নেতা হঠাৎ চমকে যায় —

নেতা : গোলমাল! এখানেও গোলমাল? গোরস্থানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার! ঐ গোর-খুঁড়েগুলো দু একটা আপত্তি তুলেছিল, সেটা মেটাতে একটু দেরি হয়ে গেল।

নেতা : আপত্তি ? টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোনো গোলমাল করেননি তো ? আপনাকেও বলেছি যে, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়ে বেশি ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেব। টাকা ঢালতে আপনার কষ্ট হবে কেন? কমতি পড়লে আপনি আমার কাছে চেয়ে নিতেন।"

হাফিজ জানে সরকারের কাজে সরকার টাকা খরচ করতে পিছুপা হয় না। সে কাজ যেমনই হোক না কেন। সে নেতাকে বলে টাকা পয়সা নিয়ে কোন সমস্যা নয়। সমস্যা ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে। হাসপাতালের লাশগুলো তাড়াহুড়ো করে টেনে তোলার সময় মাংস পিণ্ডগুলো এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছে। ডাক্তাররা পোস্টমার্টাম করে জোড়া লাগায়নি ভালো করে। গোর খোড়া মানুষদের দাবি ধর্মীয়ভাবে বিচার করে লাশগুলিকে সৎকার করা হোক। এই ঝামেলা মেটাতেই তার অনেক সময় লেগে গিয়েছে। এর মধ্যে আবার উপরি ঝামেলা এসে জড়ো হয়েছে মুর্দা ফকির। মুর্দা ফকির গোরস্থান থেকে বার হতে চায় না। কবরের সঙ্গে তার কথা বার্তা চলতে থাকে। লোকটি লেখা পড়া জানে। গ্রামের স্কুলের মাষ্টারি করত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে পরিবারের অন্যদের মরতে দেখেছে। কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলোকে শকুন কুকুরে ছিড়ে খেয়েছে। সেই থেকে সে কবরের কাছাকাছি থাকে। কেউ মারা গেলে যেন কবরে যেতে পারে তা দেখে। মুর্দা ফকির কোন দিক থেকে যে কোন দিকে যায় হাফিজ বুঝতে পারে না। নেতা চায় লাশগুলোকে কবর দেওয়ার সময় যারা বা যে ঝামেলা করবে তাদের কেও কবর দিতে। সে হাফিজকে নির্দেশ দেয় মুর্দা ফকিরকেও কবর দিতে। কিন্তু হাফিজ জানে কোন সমস্যায় মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হয়। গুলি চলেছে দুপুর বেলা সেজন্য নেতা ভয় পাচ্ছে। সারাদেশময় খবর ছড়িয়ে পড়েছে। মুর্দার কানেও খবর এসে থাকবে। কোথায় লাশগুলোকে কবর দেওয়া হচ্ছে সে দেখছে। সকলকে সে যদি জানিয়ে দেয় তখন সমস্যা হতে পারে। হাফিজ জানায় এমন কোন সমস্যা হবে না। সে ফকির সম্পর্কে জেনেছে —

হাফিজ : মুর্দা ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ও তো একরকম কবরের বাসিন্দা। ভাষার দাবিতে মিছিল বেরিয়েছিল বলেই পুলিশ গুলি করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে — এত কথা বোঝবার মতো জ্ঞান বুদ্ধি ওর নেই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুজে দিতে চায় — কারণ ওর ধারণা মানুষ শুধু একরকমেই মরতে পারে — খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল।৭

হাফিজ ফকিরকে কুললি ম্যানেজ করতে চায়। ভান করতে পারে সে, তবে উত্তেজিত হয় না। ফকির আস্তে আস্তে হাফিজ আর নেতাদের পিছনে চলে আসে। ফকিরকে দেখে দুজনেই ভয় পেয়ে যায়। ফকির হাফিজকে জানিয়ে দেয় তোমার বাঁচার কোন অধিকার নেই। তোমার মতো জিন্দা আদমিকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও করবে না। ফকির বলে দেয় সে লাশগুলোকে ভালো করে দেখেছে ওরা কেউ মারা যায়নি। ওরা মারা যেতে পারে না। ওরা কেউ কবরে যাবে না। এই লাশগুলোর মধ্যে গোলমাল আছে। কেননা ফকিরের প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল সব ঠিক আছে। উল্টেপাল্টে দেখে কোনোটার বুকের কাছে এক খাবলা মাংস নেই, কোনোটার ফাটা খুলি দিয়ে ঘিলু সব গড়িয়ে পড়ছে। কোন লাশের গন্ধ ঠিক নেই। বাসি মরার গন্ধ নেই কোথাও। সবগুলো থেকে ঔষধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ বার হচ্ছে। বিশ ত্রিশ হাত মাটির নিচে কবর দিলেও এরা কেউ কবরে থাকবে

না। মানবিক চেতনায় রঞ্জিত ফকির জানে এদের দেহের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু মানুষের মনে এরা চির জাগৃত। তাই সে হাফিজের গায়ের গন্ধ শুকে বলে দেয় —

ফকির : গন্ধ ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ ! তোমরা এখানে কী করছ ? যাও তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না ? না, না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না (গন্ধ শুঁকে) তোমাদের গায়ে মুখে পাই মরার গন্ধ। তোমাদের সময় হয়ে গেছে। ছিঃ, এ-রকম ফাঁকি দেয় না ! আমি ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ইস ! গোব-খুঁড়েরা কী ভুলই না করেছে ! না, না এ তো হতে পারে না।[৮]

হাফিজের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায়নীতি, বিবেকবোধ আর সত্যের প্রতীক হিসাবে ফকিরকে দাঁড় করিয়েছেন নাট্যকার। ফকির হাফিজের চালাকি ধরে ফেলেছে। তাই এই অন্যায় সে মেনে নিতে পারে না।

হাফিজ গর্ববোধ করছে নিজের কাজ নিয়ে। সে ভাবতে থাকে ফকিরকে বোকা বানিয়েছে। তাই মদের মাত্রাটা একটু চড়িয়ে নিয়েছে আনন্দে। হাফিজ নেতাকে একটু মজা করেই প্রশ্ন করে দেখুন মুর্দা ফকির যদি লাশগুলোর একটা মিছিল নিয়ে এসে দাঁড়ায় তখন কি হবে? নেতা মাতাল অবস্থায় জানিয়ে দেয় সে সকলকে একসঙ্গে পুতে দেবে। কিন্তু হাফিজ অনেক সতর্ক কু কর্ম হাসিল করতে হলে কতটা সাবধান হতে হয়, নিজেকে শান্ত রাখতে হয় তা সে জানে, তার ট্রেনিং সে পেয়েছে। তাই বলে ভয় না পেয়ে প্রথমে হাসব, এগিয়ে যাব, হাত মেলাবো ভয় পাবো না, নিজের গলা টিপে রেখে দেব কিছুতেই ভয় নিজের মধ্যে ঢুকতে দেব না। হাফিজের সংলাপ চলতে চলতে নাট্যকার একটি ভয়ার্ত এবং মানবিক পরিবেশ তৈরি করেছেন। মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। হাফিজ আর নেতাদের কাছে যেন একটা গুলি এসে পড়েছে। মূর্তিকে লক্ষ্য করে নেতা গুলি ছুড়তে চায়। হাফিজ বাধা দেয়। সে এটাকেও কুললি ম্যানেজ করতে চায়। কোন ঝামেলা সে করতে চায় না। হাফিজ ছায়া মূর্তি দেখে বুঝতে পারেছে গুলি খাওয়া ছাত্রের লাশ যার মাথা নেই। হাফিজ মূর্তিকে ডাকলে প্রথমে কথা না বললেও পরে সে জানায় সে কবরে যাবে না। সে বোঝাতে থাকে তুমি মারা গিয়েছ, এখানে আর তুমি থাকতে পারবে না। তবে মূর্তি মানতে চায় না যে সে মারা গিয়েছে। হাফিজ বুঝতে পারে তার সঙ্গে আলাপ করে কোন লাভ হবে না। এর থেকে বক্তৃতা করা ভালো। সে নেতাকে বলে আপনি বক্তৃতা করুণ। হাফিজ মনে করিয়ে দেয় নেতারা কোন কাজ করতে না পারলেও বক্তৃতা করতে পারে যে কোন অবস্থায়।

নেতা বলতে শুরু করেন আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরব্বিরাও আমাকে সব সময় মানে। বহুকাল থেকে এদেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছেন, শেপ দিয়েছেন এবং বড় করে তুলেছেন। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তিনিই একচ্ছত্র মালিক ! কোটি কোটি লোক তার হুকুমে ওঠে বসে। নেতাদের ঠাটবাটে দেশ চলে। নেতা বোঝাতে চায় তোমরা দেশের বুদ্ধিমান ছেলে। উঁচু ক্লাসে উঠেছ আমার কথা বুঝতে পারবে। মূর্তিও সঙ্গে সঙ্গে

জবাব দিয়ে দেয় একসময় বুদ্ধি ছিল এখন মাথাও নেই ঘিলুও নেই। নেতার কথার তোমাদের বেঁচে থেকে লাভ নেই। অশান্তি লাগানো ছাড়া ছাত্ররা কিছুই করতে পারে না।

নেতা : জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও ! কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মতো ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছ না।

নেতারা সারাজীবন চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি করে এসেছে। তারা মানুষকে ভুল পথে চালিত করে ভুল প্রতিশ্রুতি দিয়ে। মূর্তিগুলোকেও নেতা এখনও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তোমাদের সমস্ত দাবি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। মনুমেন্ট গড়ে দেবেন দেশজুড়ে ছাত্রদের কথা ছড়িয়ে দেবেন। নেতা সমস্তটাই করে দেবেন শুধুমাত্র তাদেরকে চুপচাপ কবরে চলে যেতে হবে। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি নেতার চালাকি বা বুজরুকি যাই বলি না সে ধরে ফেলেছে। নেতার চরিত্র সে সবার সামনে তুলে ধরেছে। এর আগেও সে কথা দিয়ে কথা রাখেনি। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি হাইকোর্টের কেরানি ছিল। তাদের অনেক দাবিদাওয়া নিয়ে তারা দেড়মাস ধরে ধর্মঘট পালন করছিল। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেবারও তাদের ধর্মঘট ভেঙ্গে দেন এই নেতা। সেবার তার ছোট্ট ছেলেটা মারা যায়। কিন্তু নেতা তার কথা রাখেনি। তাই তারা কেউ কবরে যাবে না। হাফিজের মাথায় বুদ্ধি খুলে গেল। মূর্তিগুলোকে কবরে পাঠানোর জন্য সে মূর্তিদের মায়ের কণ্ঠস্বরে কথা বলতে লাগলো। ছেলের মৃত্যুর জন্য মা দুঃখ পাচ্ছে। মায়ের কণ্ঠস্বরে হাফিজ আরো বলতে লাগলো, মায়ের কষ্ট তোরা বুঝবি না। মা'র বুক খালি করে দিয়ে চলে গেলি। মায়ের কণ্ঠস্বরে ছায়ামূর্তি ছেলে আহত হল মায়ের কষ্ট দেখে। মায়ের সমস্ত যন্ত্রণা ছেলে বোঝে মৃত্যুর সময় তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। গুলি লেগে নাক-মুখ দিয়ে তার রক্ত পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা তার কাছে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। সেই তার শুধু মায়ের কাথা মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল মা যেন তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। হাফিজ নানা অছিলায় তাকে কবরে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু মূর্তি যেতে চায় না।

মূর্তি : আমাকে শুতে যেতে বলছ মা ? না। না। আমি শোব না। আমি এখন শোব না মা। আমি আর কোনদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগাতে দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা — না, না আমি শোব না। আমি যাব না। আমি থাকব। আমি উঠে আসব।[১০]

দ্বিতীয় মূর্তিকে হাফিজ একরকম ভাবে বোকা বানিয়ে কবরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেও কথা শোনে না। হাফিজ ঠাণ্ডা মাথায় সবটা করতে চাইলেও নেতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সে সবাইকে গুলি মেরে দিতে চায়। নেতার হাতে গুলি থাকে না। ফকির রক্ত মাখা বুলেট এগিয়ে দেয়। আর বলে আমি ওদের ডেকে আনছি। আপনি বন্দুক লোড করুণ। ফকিরকে দেখে নেতার বুকে যন্ত্রণা উঠে গিয়েছে। হাত দিয়ে বুক চেপে

রেখেছে। অন্যদিকে ফকির কবরের দিকে তাকিয়ে বলছে সকলে উঠে আয়। তাড়াতাড়ি চলে আয়। সকলে মিছিল করে চলে আয়। আজ গুলি গুলি খেলা করতে হবে আমাদের। হাফিজ আর নেতা ভয় পেয়ে যায়। এরমধ্যে গার্ড এসে খবর দেয় কাজ সব ভালো ভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনারা চলুন অন্যরা অপেক্ষা করছে। নেতা ভাবছে তার সঙ্গে এত সময় এসব কি ঘটনা ঘটে গেল। হাফিজ জানায় গোরস্থানে এমন অনেক কিছু হয়। চলুন।

কবর নাটকটি শুধুমাত্র ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েও যেন সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হিসাবে উঠে এসেছে। স্বৈরাচারি আর সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার যতই জোরদার হোক না নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য সত্যবাদীরা বরাবর রাজপথে নেমেছে এবং আত্মবলিদান করেছে নিজেদেরকে। তাই নাটকের শেষে তারা বলেছে ছায়ামূর্তিরা মতো তারা বার বার ফিরে আসবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। প্রগতিশীল চিন্তাচেতনায় শান দেওয়া নাট্যকার মুনীর চৌধুরী তার নাটকে মানবিকতার প্রকাশ করেছেন। রক্ষণশীলতা আর প্রগতিশীলতার যে দ্বন্দ্ব তিনি অনুধাবন করেছেন তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এখানে। 'পরাক্রমশালী রাজনীতির দৌরাত্ম ও জনগণের অসহায়তা এবং আদর্শবাদী চিন্তাধারার মাহাত্ম্য রচিত হয়েছে নাটকটির সংলাপের অভিনবত্বে ও উপস্থাপনার চমৎকারিত্বে। রাজনৈতিক প্রতাপ, অহমিকা, জনগণের নাম করে নিজেদের উদরপূর্তি, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ যে জাতিগত ভাবে হীনমন্যতাকে লালন করে, তার বাস্তব চিত্র মুনীর চৌধুরী নির্মাণ করেছেন 'কবর' নাটকে'[১১]

মুনীর চৌধুরী একটি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছিলেন কবর নাটকে মার্কিন নাট্যকার উইন শ'র 'বেরি দ্য ডেড' নাটকের প্রভাব আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত তরুণরা কবরে যেতে অস্বীকার করেছিল। মুনীর চৌধুরীর অবচেতন মনে এই ঘটনাটির একটি ছাপ ছিল সেটারই প্রকাশ হয়েছে কবর নাটকে। তবে উইন শ'র নাটকে সৈনিকদের বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ ও বাস্তবরূপে উপস্থিত হয়েছে আর কবর নাটকে বাস্তবতার বিভ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে নেতা ও হাফিজকে অর্ধ-মাতাল এবং অপ্রকৃতিস্থ করে। সেজন্য নাট্যকার মমতাজ উদদীন আহমদ মন্তব্য করেন— এমন সুদূর প্রসারী আর প্রান্তিক ভারসাম্যের কারণে 'কবর' নাটককে কখনই অনুসারী নাটক বলা যায় না। যদি বলতে হয় তাহলে পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটককে কাহিনি ভাগের জন্য অনুকৃতির দায় বহন করতে হবে।

বিষয়বস্তুর নতুনত্বে, চমৎকার সংলাপ, মঞ্চ ও উপস্থাপনার অভিনবত্বে 'কবর' একটি সফল নাটক। ভাষা আন্দোলনকে অবলম্বন করে নাটকটি রচিত হলেও তা সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে বাঙালীর অস্তিত্ব সংগ্রামে পরিণত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। আনিসুজ্জামান— মুনীর চৌধুরী রচনা সংগ্রহ — ১, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৭০০।

২। বাংলা ভাষা আন্দোলন, উইকিপিডিয়া, পৃষ্ঠা— ১৭ (https- bn.wikipedia.org wiki)
৩। বাংলা ভাষা আন্দোলন, উইকিপিডিয়া, পৃষ্ঠা — ১৭ (https- bn.wikipedia.org wiki)
৪। প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃষ্ঠা — ৬৯৬
৫। প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃষ্ঠা — ৭০১
৬। প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃষ্ঠা — ১৮২
৭। প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃষ্ঠা — ১৮৬
৮। প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃষ্ঠা — ১৮৮
৯। প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃষ্ঠা — ১৯২
১০। প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃষ্ঠা — ১৯৪
১১। আশরাফ পিন্টু- মুনীর চৌধুরীর কবর, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৭, ২০১৭।

এবং মুশায়েরা